ইতোমধ্যেই পৃথিবীকে যেভাবে বদলে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শুধু তার নিজ দেশের নেতা নন। তিনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি যা করেন তা আমাদের সবার জীবনে কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে। ডোনাল্ড ট্রাম্পও সে দিক থেকে ব্যতিক্রম নন। ঠিক কীভাবে পৃথিবীকে বদলে দিয়েছেন ট্রাম্প?

আমেরিকাকে বাকী বিশ্ব কীভাবে দেখে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে মহান দেশ’। কিন্তু সম্প্রতি ১৩টি দেশে চালানো পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে, মি. ট্রাম্প বিদেশে তার দেশের ইমেজ বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু করেননি।

ইউরোপের অনেক দেশেই আমেরিকা সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা আছে

এমন মানুষের পরিমাণ এখন গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে।

যুক্তরাজ্যে ৪১ শতাংশ লোকের মনে ইতিবাচক ধারণা আছে, কিন্তু ফ্রান্সে এ ধারণা পোষণ করেন ৩১ শতাংশ লোক – যা ২০০৩ সালের পর সর্বনিম্ন। আর জার্মানিতে এই হার মাত্র ২৬ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র করোনাভাইরাস মহামারির ব্যাপারে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা ছিল এ ক্ষেত্রে একটা বড় নির্ণায়ক।

মাত্র ১৫ শতাংশ মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবে ভাইরাস মোকাবিলা করেছে – বলছে জুলাই ও আগস্ট মাসে পাওয়া তথ্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্টো পথে হাঁটা

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ঠিক কি বিশ্বাস করেন – তা বলা বেশ কঠিন।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকে একটা “ব্যয়বহুল ধোঁকা” থেকে শুরু করে একটা “গুরুতর বিষয়” এবং “আমার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ” পর্যন্ত নানারকমের আখ্যা দিয়েছেন।

তবে এটা ঠিক যে দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাস পরেই তিনি – বিজ্ঞানীদের হতবাক করে – ঘোষণা করেছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকাকে বের করে নেবার কথা।

ওই চুক্তিতে প্রায় ২০০টি দেশ মিলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রির নিচে রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ।

গবেষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে মি. ট্রাম্প যদি পুনঃনির্বাচিত হন

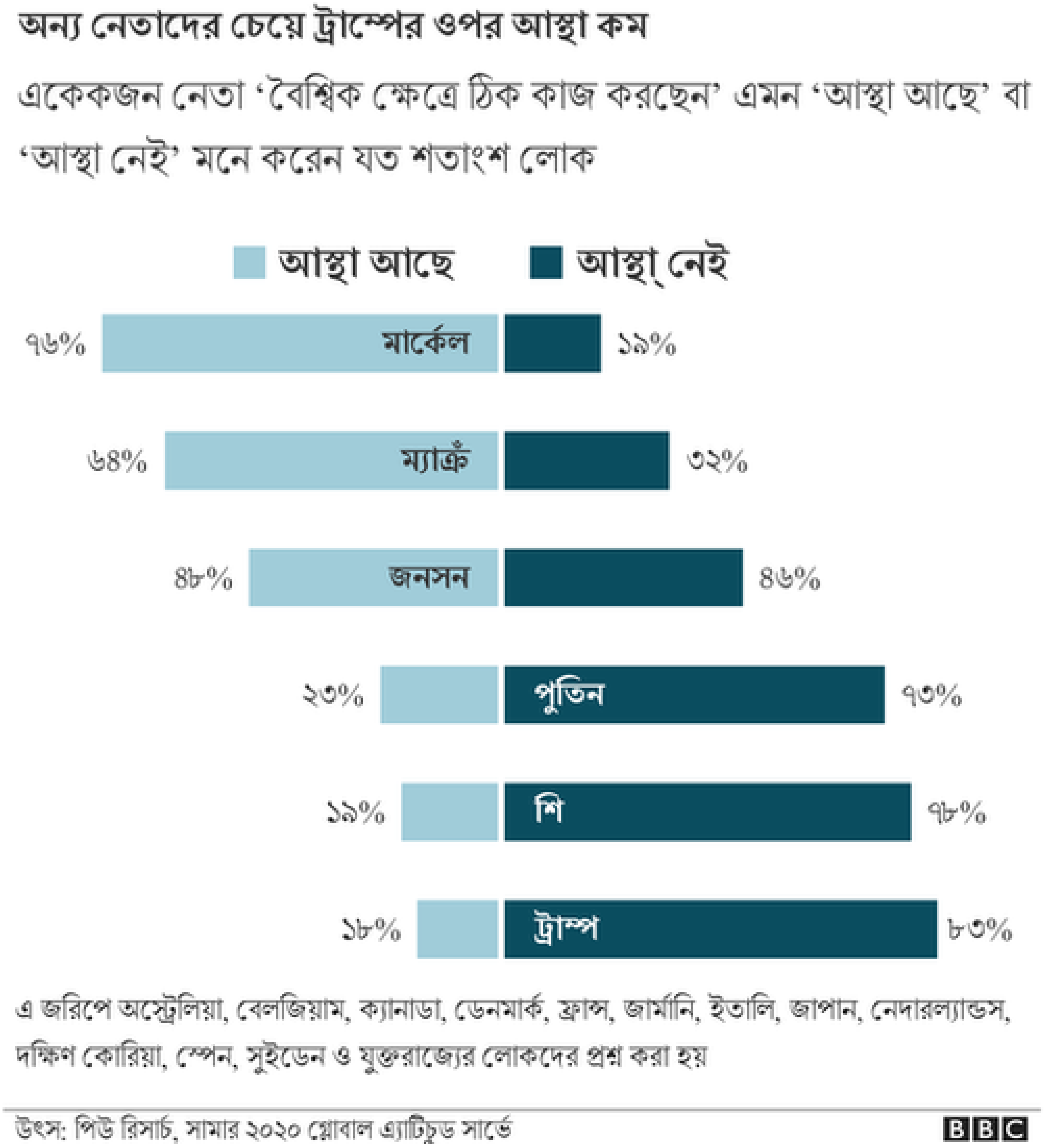

– তাহলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

প্যারিস চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে মি . ট্রাম্প দাবি করেছিলেন , এর ফলে অতিরিক্ত নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের কারণে বহু আমেরিকান পণ্য উৎপাদকদের কারখানা বন্ধ করে দিতে হতো।

এটা মি . ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির একটা মূল বার্তায় পরিণত হয়েছে এবং তিনি বহু রকমের দূষণসংক্রান্ত নিয়মনীতি বাতিল করেছেন যাতে কয়লা , তেল ও গ্যাসের উৎপাদন খরচ কমে যায়।

প্যারিস চুক্তি ত্যাগ কার্যকর হবার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক পরের দিন ৪ঠা নভেম্বর।

অনেকে ভয় পেয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাবার ফলে হয়তো আরো অনেক দেশ একই কাজ করবে।

তা যদিও হয়নি , তবে কিছু বিশ্লেষক মনে করেন ব্রাজিল ও সৌদি আরব যে কার্বন নির্গমন কমিয়ে দেবার অগ্রগতি আটকে দিয়েছে – তা ট্রাম্পের পদক্ষেপের ফলে সহজ হয়েছে।

মি . ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন অঙ্গীকার করেছেন , তিনি জিতলে যুক্তরাষ্ট্রকে আবার প্যারিস চুক্তিতে ফিরিয়ে আনবেন।

কিছু লোকের জন্য সীমান্ত বন্ধ

ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবার এক সপ্তাহ পরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাতটি মুসলিম -সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ভ্রমণকারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত বন্ধ করে দেন।

বর্তমানেও ১৩টি দেশের ক্ষেত্রে কড়া ভ্রমণ বিধিনিষেধ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন কিন্তু বিদেশে জন্ম নিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা ২০১৬ সালের চেয়ে ২০১৯ -এ ৩ শতাংশ বেড়েছে।

তবে এই অভিবাসীদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।

মি . ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হবার পর মেক্সিকোয় জন্ম নেয়া অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে , কিন্তু লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে জন্ম এমন

অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে।

যেসব ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া যায় – এমন ভিসার নিয়মনীতি কঠোরতর করা হয়েছে – বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, তাদের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির একটা প্রতীক হয়ে উঠেছিল "এক বিরাট ও সুন্দর দেয়াল" – যা তিনি যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে গড়ে তুলবেন বলে বলেছিলেন।

তবে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৩৭১ মাইল দেয়াল নির্মিত হয়েছে।

আর এর প্রায় পুরোটাই হয়েছে এমন সব জায়গায় – যেখানে আগে থেকেই বেড়া দেয়া ছিল, শুধু পুরোনো বেড়া নতুন করে বানানো হয়েছে মাত্র। এবং, আমেরিকায় আসার জন্য যারা বেপরোয়া, – তাদের দমাতেও পারেনি ট্রাম্পের দেয়াল।

গত ১২ বছরের মধ্যে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে সবচেয়ে বেশি লোক আটক হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ সালে ৮৫,০০০ শরণার্থী ঢুকেছিল। তবে পরের বছর এ সংখ্যা ৫৪,০০০-এ নেমে আসে।

তবে ২০২১ সালে এর সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১৫,০০০ – যা হবে ১৯৮০ সালের পর সবচেয়ে কম।

'ফেইক নিউজ' বা ভুয়া খবরের উত্থান

"আমার মতে আমি যত শব্দ ব্যবহার করেছি তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে ফেইক" – ২০১৭ সালে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মি. ট্রাম্প।

ফেইক নিউজ কথাটা ট্রাম্প উদ্ভাবন করেননি, কিন্তু তিনি এটাকে জনপ্রিয় করেছেন।

এক জরিপে বলা হয়, ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে শুরু করে তিনি প্রায় ২,০০০ বার কথাটা ব্যবহার করেছেন।

গুগলে ফেইক নিউজ কথাটা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সারা বিশ্ব থেকে ১১০ কোটিরও বেশি 'সার্চ রেজাল্ট' পাওয়া যাবে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬-১৭ থেকে এ আগ্রহ ক্রমাগত বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার

বিবেচনায় যেসব খবর ‘ভুয়া’ তার জন্য একটা পুরস্কারও ঘোষণা করার পর এ আগ্রহ শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে।

এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ফেইক নিউজ কথাটা ব্যবহার করতে শুরু করেন ‘তিনি নিজে একমত নন এমন’ খবরকে আক্রমণ করার জন্য।

তিনি ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতে কিছু সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকান জনগণের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন।

থাইল্যান্ড, ফিলিপিন, সৌদি আরব ও বাহরাইনের নেতারাও এ কথাটা ব্যবহার করতে শুরু করেন।

অনেকে বিরোধীদল ও সাংবাদিকদের দমন-পীড়নকে বৈধতা দেবার জন্য ফেইক নিউজ ছড়ানোর অভিযোগকে ব্যবহার করেন।

সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলো বলেছে, বিশ্বাসযোগ্য খবরের বিরুদ্ধে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রকে হেয় করছেন।

আমেরিকার ‘সমাপ্তিহীন যুদ্ধ‘, এবং একটি মধ্যপ্রাচ্য চুক্তি

মার্কিন কংগ্রেসে ২০১৯ সালে এক ভাষণ দেবার সময় মি. ট্রাম্প সিরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করে বলেন, “কোন মহান জাতি সমাপ্তিহীন যুদ্ধে জড়ায় না।”

তবে আসল বাস্তবতা ঠিক এরকম নয়।

সিরিয়ায় তেলকূপগুলো সুরক্ষিত রাখতে মি. ট্রাম্প প্রায় ৫০০ জন মার্কিন সৈন্য রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় বিভিন্ন মাত্রায় সৈন্য সংখ্যা কমলেও
– মি. ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন হবার দিন যেসব দেশে মার্কিন সৈন্য উপস্থিত ছিল – আজও তার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে।

তবে মধ্যপ্রাচ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সৈন্য ছাড়া অন্য উপায়েও প্রভাব ফেলেছেন।

তিনি ২০১৮ সালে ইসরায়েলে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে আনেন তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে, এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমসহ পুরো শহরটিকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতিও দেন।

এক্ষেত্রে তিনি আগেকার মার্কিন প্রেসিডেন্টদের আপত্তিকে উল্টে

দেন।

গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন যখন ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চুক্তি করে – তার মধ্যস্থতায় ভুমিকা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একে "নতুন মধ্যপ্রাচ্যের সূচনা" বলে অভিনন্দিত করেন।

বাগাড়ম্বর বাদ দিলে এটিই হয়তো ট্রাম্প প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অর্জন।

কীভাবে (বাণিজ্য) চুক্তি করতে হয়

মি. ট্রাম্প নিজে যে চুক্তি করেননি – সেগুলোকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না বলেই মনে হয়।

ক্ষমতায় এসে প্রথম দিনই তিনি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট ওবামার অনুমোদিত ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ নামে ১২-জাতির একটি বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে দেন।

এতে অবশ্য চীনেরই লাভ হয়, কারণ তারা একে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের প্রভাব কমানোর চেষ্টা হিসেবেই দেখছিল।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে যারা মনে করছিল যে এতে আমেরিকানদের চাকরি বিপন্ন হবার ঝুঁকি তৈরি হবে – তারা উল্লসিত হয়।

উত্তর আমেরিকান ফ্রি-ট্রেড চুক্তি – যা ক্যানাডা ও মেক্সিকোর সাথে হয়েছিল – তার আলোচনা নতুন করে করানো হয় ট্রাম্পের সময়। তিনি বলেছিলেন, এটা সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ চুক্তি।

কিন্তু নতুন করে যখন এ চুক্তি করা হয়, তখন দেখা যায় – এর বেশিরভাগই অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা ছিল কীভাবে সারা বিশ্বের বাণিজ্য থেকে আমেরিকা লাভবান হতে পারে। এর ফলে চীনের সাথে যুক্তরাজ্যের এক তিক্ত বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু হয়, দু'পক্ষই পরস্পরের পণ্যের ওপর শত শত কোটি ডলারের কর বসায়।

পরে ২০১৯ সালে দেখা যায়, চীনের সাথে পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ২০১৬ সালের চেয়ে কিছুটা কমেছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো চীনে যা রপ্তানি করে তার চেয়ে বেশি চীন থেকে আমদানি করে।

চীনের সাথে দ্বন্দ্ব

মি. ট্রাম্প নির্বাচনে জিতেছেন কিন্তু তখনও প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হননি – এমন এক সময় ২০১৬র ডিসেম্বরে – তিনি একটি টুইট বার্তায় পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেন।

যে তাইওয়ানের সাথে ১৯৭৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন – তার প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলেন মি. ট্রাম্প। এই ফোনালাপ নিয়ে উইকিপিডিয়াতে একটি পৃষ্ঠা আছে।

চীন তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করে না বরং তাদের একটি প্রদেশ বলে মনে করে।

এর মধ্যে দিয়েই চীনকে নানা দিক থেকে খোঁচানোর সূচনা করেন মি. ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ভূখন্ড দাবিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, তাদের পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েছে, তাদের এ্যাপ টিকটক ও উইচ্যাট ডাউনলোড নিষিদ্ধ করেছে, চীনের বৃহৎ টেলিকম কোম্পানি হুয়াওয়েকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

চীন অবশ্য এর মধ্যে হংকংএ বিতর্কিত এক নিরাপত্তা আইন জারি করেছে, এবং সংখ্যালঘু মুসলিম উইঘুরদের গণহারে কারাবন্দী করেছে – যা এই উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য অংশত দায়ী।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোভিড-১৯এরও নিজস্ব নাম দিয়েছেন “চায়না ভাইরাস”।

এগুলোর সবই চীনকে ব্যাপকভাবে ক্ষিপ্ত করে।

অবশ্য মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জিতলেও যে এর পরিবর্তন হবে – তা কিন্তু নাও হতে পারে।

জো বাইডেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি -কে একজন 'গুণ্ডা' বলে অভিহিত করে বলেছেন, তার দেহে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই।

ইরানের সাথে প্রায় যুদ্ধ

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত রাখতে শক্তিধর দেশগুলোর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল – প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৮ সালের মে মাসে তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনেন। দেশটির ওপর আরোপ করেন কড়া সব নিষেধাজ্ঞা।

ইরানে ব্যাপক মন্দা দেখা দিল, খাদ্যের দাম ৬১% বেড়ে গেল। শুরু হলো গণবিক্ষোভ।

১৯৭৯ সাল থেকে চলতে থাকা ইরান-মার্কিন দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হলো এভাবেই।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৯ সালে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে জানালেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সবচেয়ে শক্তিধর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছে – যিনি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইরানের সামরিক কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দিতেন।

ইরান পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইরাকে দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো – যাতে শতাধিক মার্কিন সৈন্য আহত হলো।

বিশ্লেষকরা মনে করছিলেন, দু-দেশ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধ অবশ্য হয়নি, কিন্তু ইরানী বাহিনী ভুলবশতঃ একটি ইউক্রেনিয়ান যাত্রীবাহী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করলো – নিহত হলো ১৭৬ আরোহীর সবাই।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে গুরুতর আক্রান্ত দুটি দেশের রাজনৈতিক মনোযোগ এখন মহামারি ঠেকানোর দিকেই।

তবে তাদের মধ্যে কূটনৈতিক চ্যানেল খুবই সীমিত।

অন্যদিকে - উত্তেজনা আকস্মিকভাবে বেড়ে যেতে পারে – এমন সম্ভাবনা আছে অনেক ক্ষেত্রেই।

বিবিসি

প্রতিবেদনটি জনস্বার্থে প্রকাশ করা হলো